হে প্রেস ক্লাব আমার!

ফয়েজ আহমদ

এক কালে প্রেস ক্লাব আমার মাতৃভূমিসম ছিল। ছুটি থাক বা না থাক, প্রেস ক্লাবে গিয়ে আড্ডা বা তাস না খেললে আমার সেদিনটা বৃথা যেত। বেশিরভাগ সময় সকালে নাশতা না খেয়ে এক কাপ চায়ের পর সোজা প্রেস ক্লাব। এখানে এসে লুচি-তরকারি-ডিম আর চা না খাওয়া পর্যন্ত যেন স্বস্তি নেই। পৃথিবীতে এমন নাশতা যেন আর কোথায়ও নেই।

রিপোর্টিং এর জীবনে অনেকদিন গেছে, যখন সকাল সাড়ে ৮টায় তেজগাঁও বিমানবন্দরে আমাকে উপস্থিত হতে হয়েছে। সেই সময় বিমান আসতো করাচী থেকে । তখন পর্যন্ত প্রেস ক্লাবে যাইনি বলে এবং যাইনি বলে মনের কোথাও একটা শূন্যতা বিরাজ করছে। প্রেস ক্লাবকে নিয়ে আমার জীবনের বহুতর বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী আছে। যার বর্ণনা অতি দীর্ঘ। প্রেস ক্লাবের সৃষ্টিটাই হয়েছে অদ্ভুতভাবে। তখন ইত্তেফাক পত্রিকা হয়েছে। বলতে গেলে ইত্তেফাক, মর্নিং নিউজ, অবজারভার, আজাদ, মিল্লাত, সংবাদ নিয়ে ছয়টি দৈনিক। এসব পত্রিকার সাংবাদিক ছিল অধিকাংশই ঘরমুখো। ঢাকায় সাংবাদিক কোথায় পাওয়া যাবে? কলকাতা থেকে এসেছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাংবাদিক। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি জুনিয়র, কেউ কেউ সিনিয়র। এ দিয়ে তো ছয়টি কাগজ বের করা সম্ভব না। বাধ্য হয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে উৎসাহী ও লেখালেখিতে অভ্যস্ত ছেলেদের এনে সাংবাদিকতার টেবিলে বসালেন। প্রথম দিকে অধিকাংশ ছাত্র-সাংবাদিক সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল, ঢাকা হল, মেডিক্যাল কলেজসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আনা এইসব আগ্রহী ছাত্র হয় পার্ট টাইম, নয় ফুলটাইম কাজ করতো। তাই দিয়ে পত্রিকা চলতো। পরিপূর্ণ সাংবাদিকের অভাবে একসময় অবজারভার মোটা বেতনে কলকাতার নামকরা দু'জন সাংবাদিককে অমৃতবাজার থেকে চাকরি দিয়েছিল। এই সাংবাদিক-দুর্ভিক্ষের দিনে স্বাভাবিকভাবেই পত্রিকাগুলোতে বিশেষ করে ছাত্রদের মোটামুটি আধিপত্য দেখা যায়।

যুক্তফ্রন্টের আমলের ইতিহাস বড় বিচিত্র। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হককে '৫৪ সালের ৩০ মে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে আখ্যায়িত করেন কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) এবং একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২ (ক) ধারা জারি করে গভর্নরের শাসন জারি করেন। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা লাঠি হাতে গভর্নর হয়ে ঢাকায় এলেন। শেরেবাংলাকে কেন্দ্র রাষ্ট্রদ্রোহী বলেই ক্ষান্ত হয়নি; তারা তাঁকে কে এম দাস লেনে গৃহবন্দী

করে রাখে। সেইসময় বিখ্যাত আইসিএস এন এম খানকে চীফ সেক্রেটারি করা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনিই বাংলাদেশের শাসক হয়ে দাঁড়ান। '৫৪ সালের এই সময়ে সংবাদের প্রাক্তন এডিটর খায়রুল কবীর ইনফরমেশনের স্পেশাল অফিসার হিসেবে যোগদান করেছিলেন। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে তিনি এন এম খানের বন্ধু হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে খায়রুল কবীর এন এম খানের কাছে প্রস্তাব করেন যে, ঢাকায় সাংবাদিকদের একটা ক্লাব থাকা বাঞ্ছনীয়। এন এম খান সর্বময় কর্তা হিসেবে ঢাকায় বহু সংখ্যক বাড়ির অধিকর্তা। এখন আমাদের প্রথম যে প্রেস ক্লাব ছিল, সেই বাড়িতে এক সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন বসু বাস করতেন। পরবর্তীকালে খাজা নাজিমুদ্দীনের সময় নূরুল আমিন এই বাড়িতে খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে থাকতেন। পরে মন্ত্রী আফজাল এই বাড়িতে থাকার পর যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগ ক্ষমতা হারায়। সেই থেকে বাড়িটি খালি। তারপর থেকে ঢাকায় মন্ত্রীদের বাড়িগুলো খালি হয়ে যায়। চামেরি হাউস, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ি, বর্তমান চীফ জাস্টিসের বাড়ি এবং মিন্টো রোডের বহুসংখ্যক বাড়ি নির্মিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর। আমাদের প্রেস ক্লাবের আদি বাড়িটিও এগুলোর মধ্যে একটি। বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ ছিল ভবিষ্যতের সরকারের জন্যে সেক্রেটারিয়েট। বর্তমান ফরেন অফিসের দোতলা পর্যন্ত বাড়িটি তৈরি হয় নিউ সেক্রেটারিয়েট নামে।

বঙ্গভঙ্গের পর যে সরকার হওয়ার কথা ছিল, তাদের জন্যেই ঢাকাতে বিভিন্ন সময় এই সমস্ত বাড়িঘর সরকার তৈরি করেছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকটি বাড়িতে রান্নাঘর মূল বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বাড়ি ও অফিসগুলো ইংরেজ আর্কিটেক্টের পরামর্শে করা। আমরা এই সমস্ত বাড়ি পূর্ববর্তী সরকারগুলোর সূত্র ধরে পেয়েছি। কার্জন হলও ব্রিটিশদের তৈরি, ভাইসরয় লর্ড কার্জনের নামে। পুরনো হাইকোর্ট তৈরি করেছিল ইংরেজরাই। বর্ধমানের মহারাজা 'বর্ধমান হাউজ' তৈরি করে দিয়েছিল, যা এখন বাংলা একাডেমী। এক সময় মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন এ বাড়িতে বাস করতেন। যুক্তফ্রন্টের দাবিতেই এ বাড়িতে বাংলা একাডেমী হয়েছে। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তোলার পরও বহু চেষ্টা করেও ইংরেজরা ঢাকাকে রাজধানী করতে পারেনি– অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এমনই ব্যাপক হয়েছিল যে, বাংলাকে আসামের কিয়দংশের সঙ্গে জুড়ে ভিন্ন কোনও প্রদেশ করা যায়নি। ১৯১১ সালে সরকার প্রধানত কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ রহিতের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।

তখন কোনও সরকার আর প্রতিষ্ঠা করা গেল না। বর্তমান বঙ্গভবনের দেয়ালের অভ্যন্তরস্থ জায়গায় তখন করা হয়েছিল লে: গভর্নরের ভবন– যিনি এসে এখান থেকে প্রদেশ শাসন করবেন। কাঠের বিরাট দরবার হলে আমরাও শেষের দিকে গেছি। বঙ্গভবনের ভিতরের চরিত্র এখন বদলে গেছে নতুন ইমারত তৈরির পর। আর সাংবাদিকদের জন্যে যে বাড়িটি ক্লাবের জন্যে নির্দিষ্ট হলো, সেটা ইডেন বিল্ডিং এর সবচাইতে নিকটবর্তী বাড়ি। খায়রুল কবীর এন এম খানকে বললেন, প্রেস ক্লাব এখানে করাটাই সবচাইতে উপযুক্ত হবে। তখন ঢাকায় সরকারের বহু বাড়ি খালি পড়ে ছিল। কারণ কোনও মন্ত্রী নেই, অতিরিক্ত সেক্রেটারি নেই। ১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন করার পর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। তখন বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের অর্ধেক নিয়ে ক্লাসের আয়োজন করা

হয়েছিল। এইভাবে ক্রমান্বয়ে ১৯০৫ সালের পর মিন্টো রোড ও অন্যান্য স্থানে সরকারী বাড়িগুলো প্রফেসর ও সরকারী অফিসারদের বাড়িতে পরিণত হয়। ঢাকার এই পরিবর্তনের সময় ১৯৫৪ সালে সরকার প্রদত্ত বাড়িতে প্রেস ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়। সেখানেই আমরা, অর্থাৎ বর্তমানে প্রাচীন সাংবাদিকেরা নতুন এক জীবন খুঁজে পেয়েছিলাম।

নিউ সেক্রেটারিয়েট বা বর্তমানে ফরেন অফিসের যে মূল বিল্ডিং– তা ছিল এককালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস। ওখানে এক কালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনেরও অফিস ছিল। ঢাকার এই বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও আমরা বর্ধিত হয়েছি। ঢাকায় তখন ঘোড়াগাড়ি বা টং, এক্কাতে পরিপূর্ণ ছিল। ঘোড়ার গাড়িগুলো ছিল যেন একটা চলন্ত পালকি। কোচওয়ানরা সবাই ছিলেন ঢাকার আদিবাসী। একসময় আমি সদরঘাট থেকে প্রেস ক্লাবে এসেছি ২ টাকা দিয়ে ঘোড়া গাড়িতে করে। '৫৬ সালে আমার বন্ধু বিবিসি'র নিউজ রিডার নূরুল ইসলাম একদিন সদরঘাটে আমাকে বললো, ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আমি যাবো না। তখন রিকশা চলাচল শুরু হয়ে গেছে, সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা দুই বন্ধু কোচওয়ানকে বললাম, নবাবপুরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আপনার পায়ের নিচের ঘন্টাটা প্রায়ই বাজাবেন। আমরা দুই বন্ধুই ঘন্টাটা পছন্দ করতাম। সেই ঘোড়ার গাড়ি ক্রমান্বয়ে বিয়ের ঘোড়ার গাড়িতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা আশাতীতভাবে হ্রাস পেয়েছে। এখন নাকি ঢাকায় রিকশার সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ। গাড়ির সংখ্যা দশ গুণ বেড়েছে। বাসের সংখ্যা যে কত বেড়েছে, আমরা জানি না। তবে লোক সংখ্যা বেড়ে ঢাকায় এক কোটিতে দাঁড়িয়েছে, ভাসমান মানুষসহ। তারই মধ্যে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে প্রেস ক্লাবের নতুন ইমারত। মেম্বারদের খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা, বহুরকম ফ্যাসিলিটিজ রয়েছে– যা আমাদের পূর্বের প্রেস ক্লাবে ছিল না। আমি লক্ষ্য করেছি, সে আমলে যারা প্রেস ক্লাবে আসতেন, তাদের মধ্যে সব রিপোর্টারই ছিলেন সংবাদের সন্ধানে অস্থিরতায় নিমগ্ন। কেউ দুটো খেয়েই সংবাদের পেছনে দৌড়াচ্ছে, কেউ না খেয়ে। কেউ প্রেস কনফারেন্স সেরে অবেলায় এসে খাচ্ছে। সন্ধ্যার পরেই প্রকৃত অফিস শুরু।

এই প্রেস ক্লাবে আমরা এরই মধ্যে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করেছি। এই ক্লাবে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা সেন গান গেয়েছেন। এই ক্লাবে নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক আবদুস সালাম সাংবাদিকদের সঙ্গে দীর্ঘসময় বাইরের লনে আলোচনা করেছেন। তখন সাংবাদিকদের উপর বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলের আধিপত্য ছিল না। আমরা একবার আমাদের দেশের প্রখ্যাত বাদক ও সুরকার সমর দাসকে পিয়ানো বাজানোর জন্যে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি ডান দিকের ছোট বারান্দায় বিরাট এক পিয়ানো নিয়ে উপস্থিত। আমাদের রিক্রিয়েশনের জন্যে ব্যাডমিন্টনের জায়গাটায় সবাই আমরা চেয়ারে বসেছিলাম। সমর পিয়ানো শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরই শুরু হলো 'মোজার্ত' থেকে। তাঁর বাজনা একসময় শেষ হলো। অবাক সাংবাদিকরা স্তব্ধ! তারপরই শুরু করলেন গিটার, যেটা তাঁর অত্যন্ত শখের। এবারে গিটারে চটুলতা আমাদের রক্তকে উদ্দীপ্ত করলো। অনুষ্ঠান শেষে আমরা কি করে সমরকে ধন্যবাদ জানাবো, সে ভাষা খুঁজে পাইনি। এরই মধ্যে ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছে সাঁতার কেটে। সে আমাদের গৌরবের পাত্র হয়ে দাঁড়ালো। আমরা যারা

বন্ধু ছিলাম, তাদের সঙ্গে তাস খেলতেন ব্রজেন। ঢাকায় তখন নিরেট ক্লাব কম ছিল। প্রেস ক্লাবে সদস্য ছাড়া আর কারও প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। এই ব্যাপারটার উপর কড়াকড়ি আরোপ করা হতো। কিন্তু সমর দাস, ব্রজেন দাসকে আমরা ঠেকাবো কিভাবে? তাঁরা দু'জন যখনই অবসর পেতেন, দোতলায় এসে তাস খেলতেন কাজের ফাঁকে। আমি মুকুল, মূসা, আলী আশরাফ এবং আরও কয়েকজন মাঝে মাঝে তাঁদের অপেক্ষায় তাঁদের টেবিলে বসে থাকতাম। সেইসময় হয় ব্রজেন, না হয় সমর দাস এসে উপস্থিত হতো– আমরা সোনায় সোহাগা পেতাম। কেউ তাঁদের বাধা দেওয়ার নেই। সবাই তাঁদের দাদা বলে ডাকে, মনে হয় তাঁরাও সাংবাদিক। কিন্তু তাঁরা আমাদের দেশের গৌরবের নাগরিক। বুড়ো সম্পাদকদের মাঝে কেবলমাত্র সালাম ভাই তাস খেলতে আসতেন। তাঁর তাস খেলাও বন্ধ হয়ে গেল। ব্রজেন ও সমরের এই নিয়মিত নির্বাধ আগমন লক্ষ্য করে আমরা প্রস্তাব দিলাম যে, এদের দু'জনকে প্রেস ক্লাবের বিশেষ অতিথি হিসেবে মেম্বার করা হোক। বোধহয় এ দু'জনই প্রথম ও শেষ আমাদের প্রেস ক্লাবের স্পেশাল গেস্ট। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা ক্লাবের বিশেষ সদস্যরূপে আসা-যাওয়া করেছেন। তাঁদের দুজনেরই মৃত্যু ঘটেছে। তাঁদের অভাব আমরা অবশ্যই অনুভব করি। এমন কৃতিত্বপূর্ণ জীবনের অধিকারী ব্রজেন আর সমর এখন আর আমাদের উদ্দীপ্ত করে রাখে না।

পুরনো প্রেস ক্লাব বিল্ডিংয়ে বেলা ১টা থেকে রোজই দোতলায় একটা রুমে তাসের টেবিল সরগরম হয়ে উঠতো। এই তাসের টেবিলের বহু কাহিনী, এমনকি ব্রিজে ভুল খেলার জন্যে বৃদ্ধদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত হয়েছে। এই সমস্ত কাহিনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখতে গেলে যে কোনও প্রাচীন সদস্য একটা বই লিখে ফেলবেন। আমি সেই বই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিখতে গেলেও বড় হয়ে যাচ্ছে, কারণ অনেক কথাই তো মনে পড়ে। সে থাক।

যেমন ধরুন, আমাদের তাসের টেবিলের পাশে একটি টেবিলে একদিন দুই বন্ধু সদস্যের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। বন্ধু আলী আশরাফ দেখলাম লম্বা হাত বাড়িয়ে বলছেন, 'এক থাপ্পড় দিবো'। আরেকজন দাঁড়িয়ে গিয়ে তার প্রতিবাদ করলো। অন্য টেবিল থেকে আমরা সবাই বললাম একি, একি, একি! ওই ঝগড়াটেদের টেবিলেই খেলছিল সমর দাস। আমরা সমর দাসকে বললাম, 'তুই এত বড় বিরাট দেহ নিয়ে এই টেবিলে চুপ করে বসে আছিস, একজনকেও থামাচ্ছিস না!' সমর খুব নীরবে নিশ্চিন্তে উত্তর দিল, 'আমি তো এই ক্লাবের মেম্বার নই', সবাই আমরা হতভম্ব! সমর তো ঠিকই বলেছে। বাইরের লোক হিসেবে সে এই আসরে মারামারি থামাতেও পারে না। তারপর থেকে সমরকে ব্রজেন দাসের সঙ্গে এই ক্লাবের বিশেষ সদস্য করা হলো।

একদিন রাত প্রায় দেড়টার দিকে অবজারভারের রিপোর্টার আবদুর রহিম তার স্ত্রীর কাছে নাকাল হতে চললো। কি হয়েছে? স্ত্রী বলছে, 'তুমি প্রায়ই এত রাতে আসো, ব্যাপার কি?' রহিম হাসতে হাসতে বললো– 'আর বলো না, ফয়েজ ভাই! প্রায়ই তিনি গল্প করতে বসেন, আর আমরা তার মজার গল্প শুনতে গিয়ে রাত হয়ে যায়।'
রহিমের বউ: প্রায়ই তুমি ফয়েজ ভাই, ফয়েজ ভাই বলো, কে সে ফয়েজ ভাই, এত গল্প বলে?

রহিম: পূর্বদেশ আর অবজারভার তো একই বিল্ডিংয়ের দোতলায়। কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা গল্প করি। তাতেই সময় ক্ষেপণের বিপত্তি।
রহিমের বউ: ওরকম ফয়েজ ভাই আমিও একজনকে চিনি, তিনি ছড়া লিখে বিখ্যাত। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে ছোটবেলায়। তুমি আবার কোন্ ফয়েজ ভাইয়ের কথা বলছো?
রহিম: আরে ওই তো একই ফয়েজ ভাই, তিনি ছড়াও লেখেন, সাংবাদিকতাও করেন। পূর্বদেশের চীফ রিপোর্টার, আমাদের সিনিয়র।
রহিমের বউ: তা হতে পারে না। ছড়া লেখক ফয়েজ ভাই আমাদের খুব প্রিয়। তিনি আবার সাংবাদিক কবে?
রহিম: জন্ম থেকেই তিনি সাংবাদিক। ছড়াকার ফয়েজ ভাই, আর সাংবাদিক ফয়েজ ভাই একই ব্যক্তি।
রহিমের বউ: তা কি করে হয়!
সে রাতটা তারা দ্বিমত নিয়েই কাটালো।
সকালে রহিমের টেলিফোন। তিনি বললেন, আমি যেন পাঁচটার সময় প্রেস ক্লাবে থাকি, খুব জরুরি। আমি সোয়া ৫টার দিকে প্রেস ক্লাবে গিয়ে দেখি এক টেবিলে রহিম আর রহিমের বউ। তারা চা খাচ্ছেন। আমাকে দেখেই রহিম লাফিয়ে উঠলো। বললো, 'এই যে ফয়েজ ভাই, আমরা এখানে,' রহিমের বউও আমাকে সাদরে তাদের টেবিলে ডাকলো।
রহিম বললো, 'এই সেই ফয়েজ ভাই।'
রহিমের বউ: আমি তো আপনাকে চিনি ছোটবেলা থেকে ছড়াকার হিসেবে। আপনি যে সিনিয়র সাংবাদিক, তা তো জানতাম না।
আমি: একটা কিছু প্রফেশনে থাকতে হবে তো, তাই আমি সাংবাদিক হয়েছি। এখন মধ্যবয়স।
রহিম: দেখলে তো, সাংবাদিক ও ছড়াকার একই ব্যক্তি ফয়েজ আহমদ।
রহিমের বউ আমার দিকে চেয়ে হাসলো। সেই বিকেলটা আমাদের ভালোই কেটেছে।

আমি একদিন বিকেলে এক রিপোর্টের পেছনে তাড়া করে শেষ পর্যন্ত ক্লাবে উপস্থিত। দোতলায় তাসের টেবিলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই বললো– 'আরে ফয়েজ ভাই, আসেন আসেন।' মনটা কিছুটা খারাপ হলো, কিন্তু হেসে বেরিয়ে এলাম। নিচে ডাইনিং টেবিলের কাছে আসতেই সবাই চিৎকার করে বললো, 'ফয়েজ ভাই এই টেবিলে আসেন।' মনটা আবারও খারাপ হলো, আমি হেসে বসার ঘরে গেলাম। ওখানেও কয়েকজন আমাকে একটা চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'এখানে বসুন ফয়েজ ভাই।'

মনটা চূড়ান্তভাবে খারাপ হয়ে গেল– প্রেস ক্লাবে সর্বত্রই আমাকে ফয়েজ ভাই বলা হয়। কান ঝালাপালা। কেউ আমাকে একান্ত আপন করে ডাকছে না বলে আমার মনে হলো। আমি উঠে গিয়ে নিচের তলার বারান্দায় পায়চারি করতে আরম্ভ করলাম। এমন সময় হঠাৎ একটা ফক্সওয়াগন ক্লাবের আম গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো। এক যুবক গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, গায়ে দামী বিদেশী জ্যাকেট, তাকে আকর্ষণীয় ও অপূর্ব দেখাচ্ছিল। দূর থেকে চিনিনি। কিন্তু কাছে এসেই লাফিয়ে পড়লো আমার উপর। আমাকে জড়িয়ে ধরে

বললো, 'ওই শালা, ক্যামন আছস্?' আমার প্রাচীন বন্ধু, শিল্পী আমিনুল ইসলাম। তিনি ইতালিতে কয়েক বছর শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরেছেন। তারই এই সম্বোধন।

আমি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলাম। এখন আর কেউ আমাকে 'তুই' বলে না, 'শালা' বলে না, এইভাবে জড়িয়ে ধরে না– সমীহ করে। এই আকস্মিক পরিবর্তন আমাকে বর্তমানে ব্রিবত করছে। তারপর আমিনুলের সঙ্গে চায়ের টেবিলে অনেক হাতি-ঘোড়া মারলাম। আমরা দু'জন বেরিয়ে গেলাম।

একদিন বেতন পেয়ে তাস খেলার জন্যে উদগ্রীব ছিলাম। বিকেলে আমি আর মুকুল (এম আর আখতার) যেখানে বসেছিলাম, সেখানে দু'জন বয়স্ক উপস্থিত– ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার ও মর্নিং নিউজ পত্রিকার ক্রস ওয়ার্ডের অধিকর্তা মি. মিটার। মি. মিটারের টেবিলে সর্বদা মি. মিটারই ব্যাংকার হতেন। তার কাছে একটা টিনের বাক্সে সমস্ত কাউন্টার ছিল। কাউন্টারেই আমরা খেলতাম।

খেলা চলতে চলতে যখন রাত ১১টা তখন আমি আর মুকুল দুই বন্ধু সব বেতনের টাকা হেরে গেছি। ক্লাবে একটা লোকও নাই, সবাই যার যার অফিসে। বৃদ্ধ দুই বেকার আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন আরও কয়েক ঘন্টা খেলতে। রাত বারোটায় নিচ তলার ফ্রিজ থেকে বাটি ভর্তি পুডিং আর পাউরুটি এনে খেয়ে ফেললাম। সকালে পয়সা দেব। রাত বারোটার পর খেলা আরও জমলো।

সেই খেলা চললো ভোর ৬টা পর্যন্ত। বাইরে তখন রিকশার ঘন্টা বাজছে, কাক ডাকছে। ইতোমধ্যে আমি আর মুকুল 'রিকভার' করেছি। আমাদের বেতনের টাকাটা আবার ফেরত পেয়েছি। তখন খেলা বন্ধ করলাম।

সচিবালয়ের দ্বিতীয় গেটে আমরা দোকানদারদের উঠিয়ে বললাম, গরম করে কিছু খাবার দাও। তারা আমাকে ও মুকুলকে চেনে। খাওয়ার পর মুকুল আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললো, থ্যাংক ইয়ু মি. মিটার এবং আমি মুকুলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললাম থ্যাঙ্ক ইয়ু মি. সাত্তার। প্রেস ক্লাবের এমন জীবন আর পাবো না, সেই যৌবন! সেই প্রেস ক্লাবকে আজ আমরা অন্য চোখে দেখি। ভোর পর্যন্ত তাস খেলি না।

এভাবে প্রেস ক্লাবের দীর্ঘজীবনে বহু কাহিনী আমার আছে। অনেক দুর্যোগ গেছে এই প্রেস ক্লাবে আমার। ১৯৫৮ সালে আগস্ট মাসে আইয়ুব খাঁ'র মার্শাল ল'র সময় আমরা অনেকেই পলাতক হয়ে গেলাম। সে সময় আইয়ুব খাঁ'র বশংবদরা আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করেছিল। অনেকে গোপনে সিদ্ধান্ত নিল, এর প্রতিবাদ করতে হবে। আমরা যারা ভূতলবাসী ছিলাম, তাদের কাছে খবর গেল তারাবাগে রাত ৮টায় সিকান্দার আবু জাফরের বাসার পুকুর পাড়ে সভা হবে। আমি সেই নির্দিষ্ট দিনে শহরের প্রান্তদেশ তারাবাগে জাফর ভাইয়ের বাসায় উক্ত সভায় যোগদান করলাম। হাসান হাফিজুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, এঁরা সবাই ছিলেন। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হলো প্রকাশ্য মিটিংয়ে এই হরফ পরিবর্তনের সরকারী অপচেষ্টার প্রতিবাদ করা হবে। ১১টার পর সভা শেষে যে যার বাড়িতে গেল, আশ্রয়ে গেল। আমি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে

থেকে রাতটা কোথায় কাটাই? এক ভাগ্নির বাসায় গেলাম আর্মানিটোলায়, তারা দরজা খুললোই না। তারপর ওই রিকশা নিয়ে রাত বারোটায় প্রেস ক্লাবে উপস্থিত। প্রেস ক্লাবের বৈঠকখানাতে সোফার উপর আমি আশ্রয় নিলাম, গায়ে স্যুট। দারোয়ানকে বললাম, বাইরে থেকে তালা দাও। কিন্তু রাত ৪টার দিকে হঠাৎ আমার ঘরের কপাটে টোকা। দেখলাম এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, তার সঙ্গে গোটা কয়েক পুলিশ। বুঝলাম, আমি গ্রেফতার হয়েছি। দারোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে তারা আগেই তালা খুলেছিল। ভেতর থেকে আমি দরজা খুলে বললাম, 'আসুন।' লোকটা দ্রুততার সঙ্গে ভেতরে এসে আমার পাশে বসলেন। বললেন, 'আপনাকে একটু আমাদের অফিসে যেতে হবে।' আমি বললাম, 'আমাকে গ্রেফতার করার কথা বলছেন না কেন?' উনি বললেন, 'আমার দায়িত্ব কেবল আপনাকে নিয়ে যাওয়া। চলুন।'

আমি বললাম: ভোর না হলে আমি যাবো না। জোর করে নিলে আমি চিৎকার দেবো। তাছাড়া আপনি যে আমাকে গ্রেফতার করছেন, তার নির্দেশনামা আমাকে দেখান।

লোকটা স্কুলের রুল করা খাতার একটা ছেঁড়া পাতা আমার হাতে দিলেন– তাতে লেখা আছে– 'অবিলম্বে প্রেস ক্লাবের দোতলায় গিয়ে পলাতক সাংবাদিক ফয়েজ আহমদকে পাবেন, গ্রেফতার করুন।' দস্তখতটা ঢাকার ডিআইজি'র। আমি যে ঢাকায়, একথা জেনে লঞ্চ ঘাট ও ফুলবাড়িয়া স্টেশনে আগেই লোক পাঠানো হয়েছিল। এই ভদ্রলোক এসেছেন বিশেষ এ্যাসাইনমেন্টে। ভোরের সময় যেতে আমি রাজি হয়েছি, রাতের বেলা পুলিশ আমাকে হত্যা করে গায়েব করে দিতে পারে। সে কারণে অন্যদের সাক্ষী রাখার জন্যে ভোর হতে বলেছিলাম। রাস্তায় রিকশার আওয়াজ পেয়ে বুঝতে পারলাম এখন ভোর হয়েছে। দু' একটা গাড়ি যাচ্ছে। সূর্য ওঠে ওঠে। আমি বললাম, 'এবার চলুন।'

নিচে এসে আমি দ্রুত একটা টেলিফোন করে বসলাম। আইবি'র সেই লোকটি আমার হাত ধরে বললেন, আপনি টেলিফোন করতে পারেন না। আমি বললাম, 'আপনারই কথা মতো এখনও আমাকে গ্রেফতার করা হয়নি। তাছাড়া ঢাকায় কাউকে না জানিয়ে আমি আপনার সঙ্গে যাবো না। আপনারা আমাকে গায়েব করে দিতে পারেন। তখন?' আমি ড. নন্দীকে প্রথম টেলিফোন করে ঘুম থেকে ওঠালাম। বললাম, 'আমি এইমাত্র গ্রেফতার হয়ে গেলাম। যাকে যাকে বলার বলে দেবেন।' তারপরে অনেক রিকশা ও গাড়ির ফাঁক দিয়ে আমাকে গ্রেফতার করে তোপখানা রোডের আইবি অফিসে (প্রাক্তন বিটপী অফিস) নিয়ে যাওয়া হলো। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং সেখানেই আমার কারাভোগ হলো চার বছর। আমি হাইকোর্টে জজের বোর্ডের মাধ্যমে বেরিয়ে আসি। আমার বিরুদ্ধে কোনও চার্জ ছিল না। আমি ছিলাম নিরাপত্তা বন্দী, আরও বহুজনের সঙ্গে। বিচারপতি সাত্তারের এজলাসে আমাকে হাজির করা হয়। সরকার আমাকে ছাড়েনি।

এর চাইতেও বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আমি রাত কাটিয়েছি প্রেস ক্লাবে। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ২৫শে মার্চ রাতে, বিশেষ করে তখন বাংলাদেশ ছিল অগ্নিগর্ভ। সে ইতিহাসে না গিয়ে আমার কথাটাই বলি। আমি তখন 'স্বরাজ' পত্রিকার এডিটর। সে পত্রিকায় স্বাধীনতার পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে সরাসরি লেখা হতো– ব্যানার হেডে। রাত ন'টায় শেখ

সাহেবের বাড়ি থেকে এসে প্রেসে যাই। তারপর অফিস হয়ে ফেরার পথে দেখলাম রাজপথ সম্পূর্ণ ফাঁকা। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কারও জন্যে অপেক্ষা করতে পারছে না। তখন রাত ১১টা। সেই সময় দ্রুতগামী একটা রিকশা থামিয়ে বললাম, পুরাতন শহরের যে কোনও জায়গায় আমাকে নামিয়ে দিন। সে তীব্র আপত্তি জানালো। কিন্তু আমি নামলাম না রিকশা থেকে। তোপখানা রোডের সচিবালয়ের দ্বিতীয় গেট থেকে আমি এই রিকশাটা নিয়েছিলাম। ক্ষুব্ধ রিকশাওয়ালা হাইকোর্টের গেটের মোড়ে এসে বললো, আর তো যাওয়া যাবে না। দেখা গেল, আমাদের সামনে বিরাট একটা গাছ রাস্তার ওপর পড়ে আছে। বিদ্রোহীরা মোড়ে মোড়ে এভাবেই ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে, যাতে পাকিস্তানী বাহিনী প্রবেশ করতে না পারে। কোনও উপায় না দেখে রিকশাওয়ালাকে অনুরোধ করলাম. 'আমাকে প্রেস ক্লাবের গেটে নামিয়ে দিন।' অসন্তুষ্ট রিকশাওয়ালা আমাকে নামিয়ে দিল। পকেটে যা ছিল, তাই দিলাম। প্রেস ক্লাবের বাইরের গেট টপকে ভেতরে প্রবেশ করে দেখি, সব বন্ধ। দারোয়ানদের একজনকে বাসা থেকে ডেকে আনলাম এবং উপরের সেই বৈঠকখানায় আবার আশ্রয়। বাইরে থেকে আমাকে তালা দেওয়া হলো। সেই বিভীষিকাময় ২৫ মার্চের দিবাগত রাত্রি আমি প্রেস ক্লাবের এই কক্ষেই ছিলাম। পর্দা দিয়ে ঢাকা জানালার ফাঁক দিয়ে আমি বাইরে আর রাজপথে আর্মির সব কার্যকলাপই দেখছিলাম। তারা ছিলেন দ্বিতীয় হেড কোয়ার্টার– বর্তমান ফরেন অফিসে। হাজার পাওয়ারের বাতি রাজপথে জ্বালিয়েছিল। আমি দেখছিলাম বি-৪৭ ট্যাঙ্ক, বাজুকা, স্টেনগান, ছোট মেশিনগান, টমিগান, ও তোপ ছোঁড়ার মত ছোট ছোট অনেক ট্যাংক। এর বিশদ বর্ণনা আর দিচ্ছি না। এমন সময় রাত বারোটায় পূর্ব দিকে ভীষণ কোলাহল, গুলিগোলার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপরই আকাশের দিকে অগ্নিশিখা। বুঝতে পারলাম, রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকে যুদ্ধ হচ্ছে।

একটু পরেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল আজিমপুরের নিকটবর্তী পিলখানায়। সেই গোলাগুলি সারারাত এবং সকালেও চলে। এই সময় রাত একটার পরে ট্যাংক নিয়ে পুরাতন শহরে আর্মি প্রবেশ করার সময় ঢাকার বহু অঞ্চলে আজানের ধ্বনি শোনা যায়। এই অসময়ে আজানের মাধ্যমে মুসলমানরা বলতে চেয়েছিল তারা মুসলমান, তাদের অঞ্চল আক্রমণ করো না। একটু পরে রাত ৪টার দিকে হঠাৎ দেখলাম, বড় রাস্তা থেকে একটা ছোট ট্যাংক (এম-২৪) চামেরি হাউসের ভেতরে প্রবেশ করলো। প্রেস ক্লাবের দিকে তাদের কামান দাগার জন্যে প্রস্তুতি নিল। তখন আমার ধারণা হলো, বাঁচার কোনও উপায় নেই। কারণ আমার আশ্রয়ের এই কক্ষটি হচ্ছে কামানের মুখোমুখি। আকস্মিকভাবে ক্লাবের দোতলায় কামানের গোলা দেয়াল বিদীর্ণ করে প্রবেশ করলো। আমি প্রথম গোলাতেই দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে মাটিতে শুয়ে রইলাম। ৩টি গোলা প্রেস ক্লাবে ছোঁড়া হয়েছিল। তার দু'টি প্রেস ক্লাবে এখন রক্ষিত। দেয়ালে বিরাট গর্ত হয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল।

আমি শুয়ে শুয়ে অচেতন অবস্থায় তখন ভাবছি যে, আমি মরে গেছি। আমি এখন অন্য জায়গায়। আহত অবস্থায় কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি মারা যাইনি। ভোর ৫টার দিকে মাথা উঁচু করে দেখি, সমস্ত আকাশ দেখা যাচ্ছে এবং সৈন্যরা দাঁড়িয়ে। ট্যাংক ও কামান নেই। ওখান থেকে ভোরে বেরিয়ে আসার ইতিহাস অনেক বড়। বাথরুমের পেছনে

পেয়ারা গাছের ডাল ধরে আমি নিচে নেমে আসি এবং প্রেস ক্লাবের ডাইনিং রুমে শুয়ে পড়ি। তখন আমার পা দিয়ে রক্ত পড়ছিল এবং স্যুটের অধিকাংশ জায়গা ছিঁড়ে গেছে বা উড়ে গেছে। এরপরে আমার বাঁচার অনেক কাহিনী বাদ দিয়ে বলতে চাই যে, প্রেস ক্লাব থেকে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম সেক্রেটারিয়েটের মসজিদে। ওই মসজিদ থেকে আমাকে শাদা পোশাকের সেপাইরা এসে দ্বিতীয় ১৩ তলা বিল্ডিং এর ৬ তলায় আমাকে একটি বাথরুমে আশ্রয় দেন। কারণ অসহযোগ আন্দোলনে সব বন্ধ ছিল। ওখানে আমি ২৬ তারিখ কাটাই। দীর্ঘ না করে পরবর্তী অনেক দুঃখ ও পলায়নের কথা নাই বা বললাম। কি করে এপ্রিল মাসে একটি মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের সঙ্গে আমি আগরতলা পৌছেছিলাম, সেই সমস্ত কথা এখানে থাক। যুদ্ধকালীন জীবনের কথা এখন আর নাইবা বললাম।

আমি তখন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি, পুলিশ আমাকে খুঁজছে। এক পর্যায়ে প্রেস ক্লাবে আমাদের এক বিরাট সভা হয়েছিল এবং সভায় সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াককে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল। পুলিশ আমাকে ধরতে চাইলেও আমি ওই সভায় কর্তৃত্ব করি। সভা শেষে সবাই চলে যাওয়ার পর আমি প্রেস ক্লাব থেকে বেরিয়ে যেতে অসমর্থ হই। কারণ তখন আইবি শাদা পোশাকে পুলিশ নিয়ে প্রেস ক্লাব ঘেরাও করেছিল আমাকে ধরার জন্যে। একা যখন ক্লাবে বসে রাত ৯টায় খাচ্ছি, সেইসময় একটা গাড়ি এল। গাড়ি এসে বললো, 'নেত্রী খালেদা জিয়া আপনাকে যেতে বলেছে।' আমার সন্দেহ হলো। সেই গাড়িটা বসিয়ে রেখেছে। একজন আমার প্রিয় ব্যক্তি হঠাৎ ক্লাবে উপস্থিত। আমি তার গাড়ি নিয়ে ক্লাব থেকে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হলেও পুলিশ আমাকে ধরার জন্যে নানা দিক থেকে বেষ্টনী সৃষ্টি করে। প্রথম গাড়িটি আইবি'র লোকরাই পাঠিয়েছিল বলে আমার ধারণা। সেজন্যে সে গাড়িতে আমি যাইনি। কিন্তু আমার গাড়িটা যখন ধানমণ্ডি ময়দানের কাছাকাছি এল, সে সময় তিনটা গাড়ি ব্যাপক হর্ন দিয়ে আমার গাড়িকে মাঠের পাশে স্তব্ধ করে দিল। আমার গাড়ির সামনে একটা জীপ বাঁকা হয়ে দাঁড়ালো। পেছনে একটা জীপ মাঝখানে একটা মাইক্রোবাস। একজন লম্বা ডিএসপি, খুবই ভদ্রলোক তিনি, আমার গাড়ির কপাট খুলে নিচু হয়ে বললেন, 'ফয়েজ সাহেব, বেরিয়ে আসুন।'

আমি বললাম, 'আমি তো গ্রেফতার হয়ে গেলাম। কিন্তু একটা কণ্ডিশন মানতে হবে, আমাকে এখান থেকেই সরাসরি জেল গেটে পাঠিয়ে দিতে হবে। উনি বললেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাকে আমরা জেলে পৌছাবো, অন্য কারও হাতে পড়বেন না। আমি তার এই প্রতিশ্রুতিতে মাইক্রোবাসে উঠলাম। কিন্তু গাড়িটা গেল রমনা থানায়। রমনা থানা আমার সঙ্গে অসাধারণ ভালো ব্যবহার করেছে। বন্ধুদের টেলিফোন করতে দিয়েছে। তারা আমাকে ডিম-পাউরুটি, কাবাব ইত্যাদি খাবার এনে দিয়েছে। তারা বুঝতে দেয়নি আমি গ্রেফতার হয়েছি।

সেই ডিএসপি একটু পরে এসে বললেন, 'চলুন আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো।' এরই মধ্যে তিনি আইজি, মন্ত্রী ও সেক্রেটারিসহ বিভিন্নজনের কাছে আমার গ্রেফতারের খবর টেলিফোনে অন্য ঘর থেকে বলেছেন। তিনি আমাকে জেলের পথে গাড়িতে বললেন, 'আপনি যেন অন্য কোনও এজেন্সির হাতে না পড়েন, সেটা আমরাও চাই।' কারণ আপনাকে আর্মি

ইন্টেলিজেন্স ধরার জন্যে লোক লাগিয়েছে, সেসব ভয়াবহ।' আবার আমি রাত এগারোটায় জেলে প্রবেশ করলাম।

রাজনৈতিক চরিত্রের দিক থেকে প্রেস ক্লাবে এখন আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামাত ইত্যাদি রাজনৈতিক গ্রুপ রয়েছে। আগে কিন্তু এমনও লোক ছিলেন, যারা এইসমস্ত কোনও পার্টিতেই সম্পর্কিত নন– তারা কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত। এই চরিত্রের লোকগুলো সমস্ত সদস্যদের নিয়ে এক সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখে দিয়েছিল। তারা শান্তি মিছিলেও যোগদান করে। সুতরাং এক কথায় বলে দেয়া যাবে না যে, ক্লাবের লোকমাত্রেই আওয়ামী বা বিএনপি। এরা একাত্তর সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে। তাদের ব্যবহৃত শতাধিক প্ল্যাকার্ড ও অনেক ব্যানার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে। এই প্রেস ক্লাবে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল। আর যারা অসমর্থ হয়েছিল, তাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল ঢাকাতেই, গোপনে। যে সমস্ত জামাতী বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিয়াজী ও টিক্কা খানকে সাহায্য করে বহু সাংবাদিককে হত্যা করে, তারা সবাই এই প্রেস ক্লাবের সদস্য।

প্রেস ক্লাবের সঙ্গে আমার এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নানাভাবে জীবনে ঘটেছে। আমার আত্মার সঙ্গে প্রেস ক্লাবের সম্পর্ক। স্বাভাবিকভাবেই এখন অনেক নতুন মুখ দেখি। তাদের আমি ভালোবাসি। কিন্তু অনেককেই চিনি না। আজকের এই নবনির্মিত প্রাসাদতুল্য প্রেস ক্লাবের আরও উন্নতি কামনা করি। কাচের দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে প্রেস ক্লাবে প্রবেশের কথা আমরা আগে কখনও চিন্তাও করিনি। আধুনিক জীবনকে ক্লাবে তারা আরও আপন করে নিচ্ছে। আজকাল আমি যখন আকস্মিকভাবে যাই, তখন হয়তো পুরনো কেউ থাকে না। আমি আমার অতি প্রিয় দোতলায় তাসের ঘরটিতেও যাই না। নতুনের দুরন্ত উল্লাসকে আমরা দেখতে পাই এই ক্লাবে। কিন্তু তাদের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে দুটো ভাগ হয়ে আছে। টেবিল ও সোফাগুলোও সেভাবে ভাগ করা। তবুও রাজনৈতিক এই চরম বিবাদের মধ্যে প্রেস ক্লাবের দুটো কমিটি এখনও হয়নি। নির্বাচন একটাই হয়। ইউনিয়নের মত বিভক্ত তারা এখনও হয়নি। সে জন্যে তাদের ধন্যবাদ জানাতে আমার কোনও কুণ্ঠা নেই। 'হে স্বাধীনতা'র মত করে আমার বলতে ইচ্ছে করে– 'হে প্রেস ক্লাব'.....।

শ্রুতিলিখন: মো: আরিফ-উল-ইসলাম

লেখক প্রবীণ সাংবাদিক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি